

Vol. 3 | No. 1 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি পাগলা কানাই

Volume	3
Issue	1
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুনীর চৌধুরী
Published online	June 15, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i1.5
Pages	233-242
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ-পরিচয়

Check for updates

কবি পাগলা কানাই : ডক্টর মযহারুল ইসলাম। বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী॥ দাম : সাড়ে তিন টাকা॥

পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উদ্যোগ, অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রমনিষ্ঠা আমাদের চরিত্রায়ত্ত কিনা—এ পর্যায়ের প্রশ্ন বর্তমানে আর উত্থাপনযোগ্য নয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলেই ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্যের অনেক বিস্তৃত বা অনাদৃত অংশ সকল সাহিত্যপাঠকের গোচরাধীন হচ্ছে, অনেক পরিচিত অংশ সম্পর্কেও গতানুগতিক ধারণাদির বিকারমুক্তি ঘটছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাঁদের "সাহিত্যিকী" মুদ্রিত করে এই অনুসন্ধানমূলক অভিযানের প্রকাশ্য শরীক হলেন।

"কবি পাগলা কানাই" রাজশাহীর গবেষণামূলক পত্রিকা "সাহিত্যিকী"র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। বর্তমানে তার গ্রন্থাকৃতিও শোভমানতায় বিশেষ প্রীতিকর হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৪০। আলোচনামূলক ভূমিকাটি ৪৭ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কানাইয়ের ২৪০টি গানের সংকলন। এর পরের তিন পৃষ্ঠায় পাগলা কানাই সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করা হয়েছে। শেষ দেড় পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী।

পাগলা কানাইয়ের এতগুলো গান এক জায়গায় দেখবার সুযোগ করে দিয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাদের সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে যাঁরা এযাবৎ নিষ্ঠার সংগে শ্রমস্বীকার করে আসছেন তাঁদের জন্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরো গভীর। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের (১৮১০—৯৫) একজন কৃতকর্ম পল্লীকবির এরকম ব্যাপক পরিচয়

তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ইতিপূর্বে অন্য কেউ প্রচার করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দুএকটি খণ্ডিত উদ্ধৃতির টীকাভাষ্য হিসেবে কিছু বিচ্ছিন্ন আলোচনা বা সাধারণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা হয়তো আমরা লাভ করেছি, কিন্তু পূর্ণাংগ বিচার ও উপলব্ধির জন্য যে জাতীয় সংখ্যাসমৃদ্ধ সঞ্চয়ন আবশ্যক হয়, ডঃ ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' সেরূপ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য আমরা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

পাগলা কানাইয়ের গানসমূহ ডঃ ইসলাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রধান গীতগুচ্ছের শিরোনাম রেখেছেন—বন্দনা বা হাম্‌দ ও নাত, মনকে, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, হেঁয়ালী, প্রেমের মহিমা, ইসলাম ধর্ম, অনিত্যতা ও মৃত্যু, ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা ইত্যাদি। এর মধ্যে দেহতত্ত্বের গানই সংখ্যায় সর্বাধিক, ২৯ থেকে ১০৫ সংখ্যক গান সবই দেহতত্ত্ব-মূলক। এসকল গানে নানা রূপকে দেহের কথা বলা হয়েছে এবং দেহের রূপকে নানা গুহ্য সাধনপ্রণালীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন ঃ

চারটি আঙ্গুল দেহের মাঝে বেয়াল্লিশ হাজার দ্বার
এক হাজার মেরুদণ্ড রয়
কোন্ দরজায় কেবা থাকে সেই কথা কও আমায়
না বলিলে বয়াতীর ছাও ছাড়বো না তোমায়
নাভীর নীচে কোন্ জনা আছে
বাহাত্তর সেজদা তোমার দেহের মাঝে কোন্ জায়গায় ॥ (৬৪নং গান)

পাগলা কানাই পল্লীকবি এবং সাধক কবি। হৃদয়ের বাণী রূপক আকারে গীতময় করে বলাই তাঁর স্বভাব। তাঁর কবিভাষা কোনো কোনো সার্থক চরণে বা স্তবকে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও সেগুলোর সাধারণ উৎস কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সাধন প্রণালীর বিধিবদ্ধ পরিভাষা। ভাবচিত্র বা রূপকল্পের যে বৈচিত্রের সন্ধান সেখানে পাই তার বৈশিষ্ট কাব্যিক নয় বাহ্যিক, তত্ত্বস্পর্শিত এবং বহুলাংশে গতানুগতিক। কোনো জনপ্রিয় স্বভাবকবির রচনা যখন সংখ্যাধিক্যে বিশালত্ব অর্জন করে তখন তার পক্ষে প্রথানুবৃত্তি বর্জন করা সম্ভব হয় না। কবি পাগলা কানাইয়ের গৌরব এই যায়গায় যে তাঁর অশিক্ষিত

পটুত্ব একাধিক গানে এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছে। প্রাণমনের সজীব স্পন্দন সেসব গানকে গ্রামোত্তর ও লোকোত্তর মহিমা দান করেছে। বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কেবল আন্তরিক প্রত্যয়বোধ নয়, তাকে স্থলবিশেষে রহস্যময় তীর্যক রূপক উপমার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতেও কবি প্রয়াস পেয়েছেন। 'কবি পাগলা কানাই'য়ের বিপুল সম্ভারের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বহু না হলেও বিরল নয়। ডঃ মযহারুল ইসলামের দীর্ঘ ভূমিকাটি পাগলা কানাইয়ের এই কবিসত্ত্বা ও সাধকসত্ত্বার কোন পূর্ণ ও সাংলগ্নিক বিবরণ হিসেবে পাঠ্য নয়। কাব্যমূল্য বিচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুচিত ও অস্থির ধারণাদিই এর জন্যে দায়ী। ডঃ ইসলামের আলোচনা-রীতিও গবেষণামূলক বর্ণনার সাধারণ শৃংখলা, মিতভাষিতা ও তথ্যানুগতির পরিপোষক নয়।

আমরা পাগলা কানাই সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্বেও গ্রন্থ-লেখক যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে স্তবস্তুতি নিবেদন করতে চান, তার সারবত্তা স্বীকারে অক্ষম। পাগলা কানাই ভাব-সাধক গ্রাম্য কবি, অশিক্ষিত কবি। এসকল কথা লেখক নিজেই বলেছেন। স্বীকারও করেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারে বাতুলতা।" (পৃঃ ৩১) কিন্তু এজন্যে ডঃ ইসলামের যে সংকীর্ণ ও মারাত্মক ক্ষোভ তা তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। একাধিক যায়গায় মধুসূদন, বংকিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ উত্থাপন করে প্রতিতুলনার আহ্বান জানিয়েছেন। 'যথার্থ মূল্য বিচার' করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "গ্রাম্য কবি হয়েও এবং উচ্চ শিক্ষার আলো না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা সৃষ্টি করে গেছেন—তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক চিন্তা, শিল্প-সৃষ্টি ও ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হইতে পারে।" (পৃঃ ২৬) এরপর হেম কায়কোবাদের নিকৃষ্ট চরণ উদ্ধৃত করে পাগলা কানাইয়ের 'কাব্যব্যঞ্জনার' তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন করেছেন। (পৃঃ ২৯) প্রসংগতঃ আধুনিক কাব্য এবং আধুনিকা নারী সম্পর্কে তাঁর যে ব্যক্তিগত অননুরাগ তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। (পৃঃ ৩২, পৃঃ ৩৫) রবীন্দ্রনাথের সংগে পাগলা কানাইয়ের ভাবগত ঐক্য লক্ষ্য করেছেন। (পৃঃ ২৯) বলা বাহুল্য যে

বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের শিল্পরীতি ও জীবনচেতনার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমণ্ডলের কবিবর্গের মধ্যে এ জাতীয় তুলনা অহেতুক এবং ঔচিত্যবোধহীন।

ডঃ ইসলামের এই পর্যায়ের কোন কোন অভিমত পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত। যেমন, "মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি তারই রেশ পাগলা কানাই তাঁর গানে টেনে ফিরেছেনে এ কথা ঠিক—মধ্য-যুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না।" (পৃঃ ৩১) অনাবশ্যক মুগ্ধবোধ নিয়ে তিনি যখন আরো একশেষ বিচারের অবতারণা করে বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ' যে 'ঘোরতর মানবমুখীনতা' পাগলা কানাই তার অংশীদার, "তাঁর সারা জীবনের সংগীতসাধনায় শুধু মানুষের কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানের মূল বিষয়-বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল মানুষ" (পৃঃ ৩৩) ইত্যাদি, তখন আমরা বিভ্রান্ত অনুভব করি।

ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। যেমন "তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ-রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।" (২১)—এই উক্তিটি। পাগলা কানাইয়ের দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেম, গুরুবাদ এবং সর্বোপরি হেঁয়ালী শ্রেণীর গানগুলো পাঠ করে তাঁকে যতটা বাউলপন্থী কোনো বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীতে আস্থাবান এক স্বতন্ত্র ভাব-সাধক কবি বলে প্রতীতি জন্মে ততটা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজগ্রাহ্য অস্থিতিস্থাপক ধর্মপ্রথার অনুসারী বলে মনে হয় না। ডঃ ইসলাম কর্তৃক ইসলামী গান বলে সম্মানিত একটি রচনায় আছে ঃ

আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে
নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দীদারে॥
পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত রল, বাকী চল্লিশ কোরআন হলো
নব্বই পারা ছিল কোরআন, হাদিসে পাওয়া গেল
ও তার দশ সেপারা কোন জায়গায় ছিল
পাক পঞ্জাতন হক নিরঞ্জন মিনকুল্লে
কোরআন কোন বস্তু হোল॥ (১৫৩ নং গান)

১৪৩ নং ও ১৪৫ নং গানদ্বয়ও এই প্রসংগে পরীক্ষাযোগ্য। অন্যত্র সাধন তত্ত্বের একটি গানে আছে ঃ

ওরে তোর কালি মা তার গুণপনা ভাল
সে স্বামীর বুকে পাও দিল
সেও কথাটি সভাতে বল।
আমার মা বরকত যিনি আলীর বুকে কি পাও দিছিল!
এমন বেজাইতা মা তোর কোন্ দেশে ছিল ॥ (১২০ নং গান)

এসব পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে, পাগলা কানাইয়ের শিল্পচাতুর্যের কল্পিত জটিলতা উন্মোচনের পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল তার ধর্ম-সাধনার তত্ত্বকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করা, তার মধ্যে গুহ্য-সাধন প্রক্রিয়ার যে সকল সংকেত রয়েছে —তার মর্মোদ্ধার করা এবং অপরাপর বাউলপন্থী জীবনচেতনার সংগে কানাইয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক কি ছিল তার পুনর্বিচার করা। এ ব্যাপারে ডঃ ইসলাম উৎসাহহীন।

পাগলা কানাইয়ের কাব্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একবার মাত্র ডঃ মযহারুল ইসলাম একটি প্রাসঙ্গিক তুলনার উল্লেখ করেন। সে মন্তব্যটি হোলো— "পাগলা কানাইয়ের সমসাময়িক কবিদের কাব্যে ছন্দ সৃষ্টিতে বা কথার গাঁথুনি-নির্মাণে এমন অপরিসীম কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আর কারো মধ্যেই ছিল না।" দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিচার যথাযথ সম্প্রসারণ লাভ করল না, অন্যান্য বাউল কবিদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়ও তথ্যসমৃদ্ধ রূপে উপস্থাপিত হোলো না। আমরা শুনেছি যে—"বাউল-গানের মূল বিষয়বস্তু একটি ধর্ম-তত্ত্ব ও সেই ধর্ম-সাধনার ক্রিয়াকলাপ। ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্রহীন। ব্যক্তিগত অনুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগীর রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। ...গুরু বন্দনার পদ, শরণগতির পদ, দেহ-তত্ত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে মূলতঃ প্রায় সবই সমান—ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা হইলেও ভাবকল্পনার পার্থক্য ও নূতনত্ব বা দৃষ্টিভংগির মৌলিকত্ব বিশেষ বিশেষ কিছুই নাই।" (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১০৯ ও ১১১) কিন্তু যেটুকু মৌলিকত্ব ও পার্থক্য আছে একজন কবির পরিচয় প্রদান-

কালে তা অবশ্যচিহ্নিত করে দেয়া প্রয়োজন ছিল। ভাবে ভাষায় ভংগীতে পাগলা কানাই ঠিক কোথায় কতখানি লালন শাহ, শেখ মদন, ভানু শাহ, আলীমুদ্দিন, ভেলা শাহ, হাসান, ইলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন প্রভৃতি সমধর্মী কবিবৃন্দ থেকে স্বতন্ত্র সেই জরুরী সংবাদটিই ডঃ মযহারুল ইসলাম পরিবেশন করেন নি, হয়তো অনুসন্ধানও করেন নি। এই জ্ঞানাভাব যে কতটা বর্তমান সংগ্রহের শুদ্ধপাঠ বিচারকেও দুঃখজনকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা আমরা গ্রন্থের সম্পাদনা-রীতি আলোচনাকালে পরে উল্লেখ করব। "বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্ম-তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীর বর্ণনার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্য রসের" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১) যে সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় তার সম্যক উপলব্ধির জন্যেও প্রয়োজন ছিল পাগলা কানাইকে অন্যান্য বাউল সাধক কবিদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাঁর কবি-কীর্তির পুংখানুপুংখ জরীপ করা।

নিছক তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পাগলা কানাইয়ের কালনির্ণয়ের অধ্যায়টি সতর্ক অনুসন্ধান নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। এই নয়া বিচারের ফলে পূর্বতন ধারণার মাত্র দশবিশ বছরের হেরফের হলেও, নির্ধারণ প্রণালীটি নিপুণ ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রশংসার্হ। তবে পাগলা কানাইয়ের কাল, তাঁর সঠিক নাম, তাঁর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রসংগকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করার ফলে সমগ্র বক্তব্যে কিছু পরিহার্য শৈথিল্য, পুনরুক্তি ও অতিকথন প্রবেশলাভ করেছে। কবিজীবনীর বর্ণনা ও গান সংগ্রহ রীতির ব্যাখ্যায় অবিজ্ঞানসুলভ অনেক আলাপচারিতা এই ভূমিকায় প্রশ্রয় পেয়েছে। গানের তিল পরিমাণ উক্তিকে আশ্রয় করে পাগলা কানাইয়ের শৈশব ও কবিজীবনের উন্মেষকালের যে বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে পরিণত মানসের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তা অনাবশ্যক ছিল। স্বরচিত গানের সংকেতকে অগ্রাহ্য না করেও কানাই কেন পাগলা হোলো তার অপরাপর সংগত কারণ ভাবা যেতে পারে। যেমন উপেন্দ্রনাথের মতে "বাউলরা নানা কারণে সমাজের লোকের সংগে মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে

অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষেপা) বলিয়া অভিহিত করা হয়।" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭) "কবি পাগলা কানাই"তে উদ্ধৃত আবদুল কাদির সাহেবের মন্তব্যটিও এই প্রসংগে পাঠ্য। (পৃঃ ৪৫) গান সংগ্রহের ব্যাপারে ডঃ ইসলাম নিজের বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বলেছেন "গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে। সুতরাং মাঝে মাঝে শব্দ-বিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এই বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছি—যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি।" কি প্রশ্নফলকে তিনি সত্য-শব্দ গেঁথে তুলেছেন তার স্বরূপ ব্যক্ত না করা পর্যন্ত আমরা নির্ভুল পাঠ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে অক্ষম।

পাগলা কানাইয়ের গান সম্পাদনায় এই অবৈজ্ঞানিকতা, অনুমাননির্ভরতা ও অতিপ্রত্যয়ের ঘোষণা আলোচ্য সংগ্রহের গৌরবকে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মর্যাদা লাভ করতে অংশত বাধা দিয়েছে। এক, সমগ্র সংগ্রহ সম্পাদনায় কোনো সযত্ন পরিচর্যার ছাপ নেই। ২৪০টি গানের মধ্যে মাত্র প্রথম ৩০টি গান টীকা সংবলিত, বাদবাকী দুশো বেটীক। যে পর্যন্ত টীকা যুক্ত হয়েছে সেখানেও লক্ষ্য করা যায় যে টীকার আয়তন ক্রমশঃ শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। দুই, বেশীর ভাগ টীকায় কেবল মাত্র সারমর্ম লেখা আছে। তাও গূঢ় অর্থে নয়, মামুলী অর্থে। যেমন ১৭নং সংখ্যক গানের টীকার দুই বাক্যের এক বাক্য হোলো "মনকে সঠিক পথে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কবি।" ২১নং গানের টীকা হোলো "গুরুর চরণকে অমূল্য ধন বলে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি।" ইত্যাদি। অর্থাৎ গানের যে তাৎপর্য অন্যমনস্ক শ্রোতার কাছেও বোধ্য তাকেই টীকায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে অংশ অবোধ্য বা দুর্বোধ্য টীকাকার তাকে নজরের মধ্যেই আনতে চান নি। যেমন ১৮নং গানের টীকা হোলো "কবি জীবন-নদীর ঘাটে কুম্ভীরের কথা বলেছেন—সে ঘাটে নামতে হলে গুরুভজনা করে কুম্ভীরকে বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে।" কবি যে কুম্ভীরের কথা বলেছেন তা হরফজ্ঞানী মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন কিন্তু সেই জ্ঞানালোকে কি ঐ গানের—

ঘাটে নামলে মরা মানুষ—কুম্ভীর হয় বেহুঁস
ও সেই কুম্ভীর খাইয়া কুম্ভীর খাইছে—ও তার কি
জরা মৃত্যু আছে ?
তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুম্ভীর রয়
তাজা দেখলে খইরা খায় মরা দেখলে দৌড়িয়া পলায়
পাগল কানাই কয় ও মন সাধু
আজ কেন হলি বুধু। (১৮ নং গান)

—এই স্তবকটির অর্থোপলব্ধি ঘটে ? টীকায় যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল তা অনুপস্থিত। তিন, কোনো কোনো টীকার নির্দেশিত অর্থ মূল গানের অপ-ব্যাখ্যাও বটে। ১৬নং গান দ্রষ্টব্য। চার, টীকায় শব্দার্থ-নির্দেশও সুশৃঙ্খল ও সামগ্রিক নয়। যেমন ১৯নং গানের টীকায় 'বাকসা' শব্দের অর্থ দেয়া আছে, কিন্তু চিনা, বুরুজ, কুমপুনী কিম্বা ১৯নং গানের বুধু শব্দের অর্থ কি তা বলে দেয়া নেই। হন্তে যে হইতে, সকুতলে যে সকৌতুহলে তা উল্লেখ না করলেও ততো ক্ষতি ছিল না, কারণ চরণের মধ্যে এগুলোর অর্থ আধুনিক পাঠকের কাছেও একেবারে অকল্পনীয় নয়। বিভিন্ন গানের 'মনরে রসনা', 'অধর চাঁদ', 'আগরাত খাগরাত', 'চানকা কাটা' ইত্যাদি বাক্যাংশের ভাষাগত ও তত্ত্বগত রূপ কি কারণে টীকায় আলোচনার অযোগ্য বোঝা গেল না। পাঁচ, টীকার দ্বিতীয় বাক্যটি অনেক সময়েই সংগৃহীত গানের শুদ্ধপাঠ সম্পর্কে লেখকের অপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়ের ঘোষণা মাত্র। যেমন—"আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত গানে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর—তাঁর গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে হয়।" (১৭নং গান), "এ গানও মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু আমার গানের সাথে তাঁর গানের পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে আমি যথার্থ মনে করি।" (১৫নং গান)। আমরা কি করে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি সে পরামর্শদানে টীকাকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কচিৎ এক আধ স্থলে পাঠ নির্ণয়ে অনুসৃত নীতির যে উল্লেখ করেছেন তা ঘোষণীয় নয়। ভূমিকায় তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আরেকটি উদাহরণ—"গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর। শব্দ-চয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধৃত গানটাই অধিক সংগত।" শব্দ-চয়নের

কি বৈশিষ্ট কানাইকে চিনিয়ে দিল সে কথা ডঃ ইসলাম গোপন রাখলেন কেন? ছয়, কোনো কোনো গানের টীকায় কানাই সম্পর্কে এমন মন্তব্য আছে যা সহজেই অন্য গানের উদ্ধৃতির দ্বারা নাকচ করা চলে। ৩নং গানের টীকা "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে (পৃঃ ৮০২) প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সর্বত্র খেজ্‌র স্থান কালা (কৃষ্ণ) শব্দ রয়েছে। পাগলা কানাইয়ের গানে কোথাও এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই। বিশেষ করে কোরাণে আল্লাহ্ কৃষ্ণের প্রশস্তি করেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে পারেন না। সুতরাং মুসলমানী গানও কি ভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ তারই এক নিদর্শন। এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" বর্তমান গানের অপর পাঠের মত না হলেও পাগলা কানাই যে কোনো কোনো গানে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি ব্যক্ত করেছেন তা ডঃ ইসলামের সংগ্রহ থেকেও প্রমাণ করা যায়। যেমন,

পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে
প্রেম কেউ ছাড়ো না
কৃষ্ণ প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না
এই সংসার থাকতে মর্ম
এই সংসার থাকতে ধর্ম
প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না। (১৩৫ নং গান)

সাত, গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ একাধিক ক্ষেত্রে অসম। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করা ১৪৩ নং, ১৪৫ নং, ১৪৬ নং, ১৪৭ নং, ১৫০ নং, ১৫১ নং, ১৫৩ নং গান এত স্পষ্টতই অনৈসলামিক যে শিরোনামে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে ভ্রম হয়। দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও হেঁয়ালী পর্যায়ের অনেক গানের শ্রেণীকরণে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে তার কার্যকারণ গানগুলো পাঠের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আট, ভূমিকার কিছু কথা কিংবদন্তীর পরিচ্ছেদে যুক্ত হতে পারতো। নয়, সমগ্র গ্রন্থে তত্ত্ব ও তথ্যের আশানুযায়ী সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। অধিকন্তু যেটুকু আছে তার উৎস নির্দেশ নিতান্তই নিয়মবিরহিত। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসংগিক গ্রন্থ সে তালিকায় অনুপস্থিত ; গ্রন্থোল্লেখ থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদক বা লেখকের নাম, প্রকাশের স্থান ও কাল বাদ পড়েছে। দশ, গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্যে চমৎকারিত্ব থাকলেও আমরা বলতে বাধ্য যে এর আন্তরসজ্জা আরো সুশৃংখল ও পরিচ্ছন্ন হলে পাঠসুখ বৃদ্ধি পেতো। কোন কোন পংক্তি যে কেবল অনাবশ্যক রকম বড় হরফে ছাপানো হয়েছে তাই নয়, সংগে নিম্নরেখও যুক্ত করা হয়েছে। যেমন— "যে গানগুলোর নীচে কোন নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত।" (পৃঃ ৪৭) বিভিন্ন শ্রেণীর গানের শিরোনাম কখনো পৃষ্ঠার উপরে কখনো নীচে এমন বেনিয়মে ছাপা হয়েছে যে তার সংকেত থেকে পাঠকালে ফয়দা ওঠানো কঠিন।

ত্রুটি বিচ্যুতির তালিকা হয়ত কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হোলো। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থটিকে মূল্যহীন প্রমাণিত করা মোটেই আমাদের অভিপ্রায় নয়। লেখক সুপণ্ডিত এবং বহুজনমান্য। এজন্যে তাঁর সামান্য বিচ্যুতিও আমরা নজরের বাইরে ফেলে রাখতে রাজী হইনি। নতুবা বইটি যে অতিশয় মূল্যবান, এর সংগ্রহের অংশ যে কেবল পল্লী-সাহিত্য রসিকের জন্যে নয়, পল্লী-সাহিত্যের প্রকৃত গবেষকদের জন্যেও রত্নখনিস্বরূপ সেকথা আমরা আলোচনার সূচনাতেই স্বীকার করেছি।

মুনীর চৌধুরী